দ্বীপের নাম রাঙবেলিয়া

তুষার কাঞ্জিলাল

বনের মধ্যে বসত। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এই ধরনের নয়। বাইরের অনেকের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তারা ভাবেন যে ওখানে জঙ্গলের মধ্যে মানুষ রয়েল বেঙ্গলের সঙ্গে সহাবস্থান করে চলেছেন। কখনও এওকে মারছে বা ওর ঘাড় মটকাচ্ছে। সুন্দরবন কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি। প্রত্যেকটি দ্বীপ আলাদা এবং চারদিকটা লোনা জলে ঘেরা। পশ্চিমবাংলায় সুন্দরবনের যে অংশ তাতে মোট দ্বীপের সংখ্যা ছিল ১০২টি। কালক্রমে সমুদ্র প্রায় তার দুটিকে গ্রাস করে নিয়েছে। প্রকৃতি এগুলিকে একধরনের বিশেষ কিছু গাছের আশ্রয় স্থল হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এই বনের সঙ্গে অন্যান্য জায়গায় বনের মূল ফারাক হচ্ছে লোনা জল সয়ে টিঁকে থাকতে পারে এমন প্রজাতির গাছ নিয়েই জঙ্গল। চলতি ভাষায় এই বনকে বলা হয় বাদাবন। বট, অশ্বত্থের মত লম্বা, ডাঁটো ধরনের গাছ। গাছের জঙ্গল এটা নয়। অনেকটা ঝোঁপ জাতীয় জঙ্গল, প্রকৃতি বোধহয় চেয়েছিল এই জঙ্গলে বাঘ, হরিণ, শুয়োর, বাঁদর এই ধরনের বন্যপ্রাণীদের আশ্রয় স্থল হবে এটা। বুনো আবাদ থাকবে বন্যদের অধিকারে। মানুষের আগ্রাসী মনোভাব, জমির ক্ষুধা এবং শাসকদের অপরিমেয় লোভ সেটা থাকতে দেয়নি। প্রাচীন ইতিহাস বাদ দিলে দেড় শতাব্দী আগে থেকে প্রকৃতি এবং মানুষের একটা অসম লড়াই এবং যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সে লড়াইয়ের ইতিহাস প্রকৃতি থেকে মানুষের জমি কেড়ে নেওয়ার লড়াই যা দেড় শতাব্দী কাল আগে শুরু হয়েছিল। এই লড়াইয়ের একপক্ষ ছিলেন কিছু ভূমি কাঙাল, নিরন্ন, নিরস্ত্র মানুষ আর অপরপক্ষ এইসব জঙ্গলের আদিবাসী নানা হিংস্র প্রাণীর দখল নেওয়া এবং দখল রাখার লড়াই। সভ্য সমাজ থেকে একশো-দেড়শো কিলোমিটারের মধ্যে যুগ যুগ ধরে এ লড়াই চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। এটা একে অপরকে বাস্তুচ্যুত করা এবং বাস্তু দখলের লড়াই। তাতে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং প্রাণ নিতেও হয়েছে। সুন্দরবনে মানুষের বসত গড়ে ওঠা এই রক্তক্ষয়ী প্রাণ বাজি রেখে কাউকে বাস্তুচ্যুত করে বসত গড়ে তোলার ইতিহাস খুব কম লোকেই জানেন। কেননা সুন্দরবনে ছিল প্রায় অগম্য এবং প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্যের অধিকারী কিছু দ্বীপ। যাইহোক এই ইতিহাস আলোচনায় ঢুকবোনা। তবে সংক্ষেপে বলা যায় এইভাবে সুন্দরবনের তৎকালীন ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টা দ্বীপে জঙ্গল

পুরোপুরি ধ্বংস করে জংলীদের প্রকৃতিদত্ত বসত ছেড়ে উৎখাত হয়ে যেতে হয়েছিল। এবং গড়ে উঠেছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষের বসত যার বিস্তৃতি সাগরদ্বীপ থেকে সন্দেশখালি পর্যন্ত কয়েকশো কিলোমিটার। ফলত সুন্দরবনের জঙ্গল বলে অবশিষ্ট আছে ৪৮টি দ্বীপ। এটাই আজকের সুন্দরবন। যে দ্বীপে মানুষের বাস সেখানে বন্যপ্রাণীদের বস্তুত প্রবেশাধিকার নেই। আবার যে দ্বীপ জংলীদের অধিকারে সেখানেও একই অবস্থা। তাই মনে রাখতে হবে সুন্দরবনের মানুষ জোর জবরদস্তি করে অন্যদের হকের ধন ছিনিয়ে নেওয়া অনুপ্রবেশকারী। এখনো মাঝে মাঝেই জংলীরা মানুষের ডেরায় বোধহয় হকের ধন ফিরে পাওয়ার আশায় হানা দেয় আর মানুষও জঙ্গলে কাঠ, মাছ, মধু এইসব পাওয়ার লোভে বসত ছেড়ে বনে ছড়িয়ে পড়েন। তাই কম হলেও প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলা এখনও চলছে।

সুন্দরবনে বসত গড়ে উঠেছে এমন একটি দ্বীপ, রাঙাবেলিয়ায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আশ্রয় পেয়েছিলাম। দ্বীপটি লম্বায় ৮ থেকে ১০ মাইলের মত। সে তুলনায় চওড়ায় কোথাও মাইলটাকের বেশি নয়। দুপাশে দুটি নদী বিদ্যা এবং গোমর দিয়ে ঘেরা। দ্বীপটিতে ৫টি গ্রাম। জনসংখ্যা হাজার পনেরোর মতো। এগুলি হচ্ছে পাখিরালয়, রাঙাবেলিয়া, বাগবাগান, উত্তরডাঙা, রাণীপুর। এই গ্রামগুলি আবার বিভিন্ন পাড়ায় ভাগ ছিল। এইখানের দ্বীপে যারা বসত গড়ে তুলেছিলেন তারা একটা অংশ এসেছিলেন মেদিনীপুরের মূলত কাঁথি অঞ্চল থেকে মাহিষ্য, তন্তুবায়, রাজু এই গোত্রের মানুষেরা। আর একটা অংশের বাসিন্দারা এসেছিলেন যশোর, খুলনা থেকে আসা পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়রা। তাছাড়া দু-দশ ঘর পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের মানুষও বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিলেন কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য এছাড়া বাসিন্দাদের একটা অংশ আদিবাসী সম্প্রদায়। জঙ্গল হাসিলের সময় এদের বাপ দাদাদের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল থেকে জমিদারদের আড়কাঠিরা নিয়ে এসেছিলেন। আবাদ পত্তনের পর তাদের একাংশ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন এবং যারা ফিরে যাননি তারাই এখনকার সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়। সাঁওতাল পরগণা থেকে হলেও সাঁওতালরা বেশি আসেননি। বেশিরভাগ ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ এই সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রত্যেকটি গ্রামেই একটা আলাদা অংশে এরা বাস করতে শুরু করেছিলেন। সুন্দরবনে বসত গড়ে ওঠার ইতিহাসে এদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। জঙ্গল কেটে সাফ করা এবং দ্বীপকে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা। এই বাঁধ ব্যাপারটা সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বড় ভূমিকা আছে। সে কথায় ঢুকলে মহাভারত হয়ে যাবে। এরমধ্যে রাঙাবেলিয়া দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান বলতে গেলে দুর্গাদোয়ানি এবং গোমর নদীর সংযোগস্থল থেকে সাতজেলিয়া মোড় পর্যন্ত দক্ষিণে জঙ্গল ঘেরা দ্বীপ। সেখানে মানুষের বসত অতীতেও ছিলনা এখনও নেই। সেটা বনবিবি দক্ষিণ রায়দের দখলে। কোথাও মানুষের বসত গড়ে উঠলেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও টিঁকে থাকার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গড়ে

তুলতেই হয়। তার প্রথমটি হচ্ছে খাদ্য এবং মাথার উপর একটা আচ্ছাদন। তারপরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা চাহিদা বাড়তেই থাকে। আরেকটি জিনিসের অভাব এই দ্বীপ গুলির মানুষের বিপন্ন করে তুলতো তা হচ্ছে পানীয় জলের অভাব। এই দ্বীপগুলিতে যেহেতু মানুষগুলির খাদ্য সংগ্রাহক হিসাবে বেঁচে থাকার সুযোগ ছিল না, তাই খাদ্য উৎপাদনই ছিল একমাত্র পন্থা। উৎপাদনের একমাত্র মাধ্যম জমি এবং কৃষি। কৃষির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অন্তরায় চাষ করার মত মিষ্টি জলের অভাব। চারিদিক ঘিরে শুধু জল আর জল কিন্তু তার একফোঁটাও চাষের কাজে ব্যবহার করা যায় না। নদীর জলের লোনা সহ্য করে কোনো গাছই টিঁকে থাকতে পারে না। তাই প্রথম থেকেই চাষটা বর্ষার জলের উপর নির্ভরশীল। ফলত সুন্দরবনের উৎপাদন একটি মাত্র ফসল নির্ভর। অদ্যাবধি অনেক চেষ্টা করে ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি জমিকে দোফসলি করে তোলা যায় নি। নাবাল জমিতে মোটা ধানের চাষ আর একটু উঁচু জমিতে পাটনাই ধানের চা। সুন্দরবনে মিষ্টি জলের অভাব নেই কারণ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ে ১৭০০ থেকে ১৯০০ মিলিমিটার বৃষ্টি। কিন্তু তার বেশিরভাগটাই নদীতে ফিরে যায়। কেননা দ্বীপে এই মিষ্টি জল ধরে রাখার মত আধারের অপ্রতুলতা। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ প্রথমেই শুরু হয়নি। তাই প্রতি একরে গড় ফলন ছিল আঠারো মনের মত ধান। প্রথমদিকে সুন্দরবনে আয়ের প্রায় একমাত্র উৎস ছিল বর্ষা নির্ভর ধান চাষ। এর বাইরে নদীতে প্রায় শতাধিক প্রজাতির মাছ। ডাঙাতে, খাল, বিল, নালা এবং বর্ষায় ধানের ক্ষেতেও মিষ্টি জলের মাছের জোগান। বনের ভেতরে যে খাল, বিল, নালাগুলি ঢুকে গেছে সেখানে হানা দিয়ে ভালোজাতের নোনা মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। এই মাছকে কেন্দ্র করে আয় বৃদ্ধির সুযোগ ছিল সীমিত। যতটুকু মিলত তা খটিদাররা জলের দামে কিনে নিয়ে গঞ্জে চালান করত। গঞ্জে চালান করে বেশ দুপয়সা কামাতেন। কিন্তু গরীব জেলেদের দাদনের ফাঁস থেকে কখনও মুক্তি ঘটত না। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। এই সব কারণে নদী থেকে সুন্দরবনের মানুষের আয় উপার্জনও ছিল খুব সীমিত। তবে তখনকার দিনে আমাদের মত মানুষেরা সুন্দরবনে মাছে ভাতে নয়, ভাতে মাছে থাকতাম। একদিকে নোনা মাছের জোগান অন্যদিকে চাষের মাঠ থেকে বর্ষার জল নেমে গেলে ট্যাংরা, গুলে, কৈ, মাগুর মাঠ পুকুর ছেঁচে প্রচুর পাওয়া যেত। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম ঝুড়িতে করে ট্যাংরা এবং এজাতীয় মাছ নিয়ে বেশ কিছু মানুষ দুয়ারে দুয়ারে ফেরী করে বেড়াতেন। দ্বীপের মধ্যে বাস্তু পুকুরগুলিতে মিঠে মাছের জোগান কিছুটা আয়ের সৃষ্টি করত। তারপর জঙ্গল থেকে আয়। জঙ্গলের ধারে বাস করে এমন মানুষই বেশিরভাগ জঙ্গলে ঢুকতেন, তাকে চলতি ভাষায় বলা হত মহাল করতে যাওয়া। দ্বীপের সব মানুষ মহাল করতে যেতেন এমনটি নয়। বনে যাওয়ার ব্যাপারটা বিভিন্ন ধরনের হতো প্রথমটা হচ্ছে ছুট ছাট জঙ্গলে যাওয়া এরা জঙ্গলের ভেতরে

খুব একটা ঢুকতেন না। নদী পেরিয়ে কাছাকাছি জঙ্গল থেকে গরান, বাইন, হেঁতাল এই জাতীয় ঝোপের গাছ কেটে ফিরে আসতে। এগুলি বাড়ি, ঘর বানোনো, জ্বালানী এবং কিছুটা বাইরে বিক্রির কাজে লাগত। আরেকটি ছিল জঙ্গলের অনেক গভীরে ঢুকে প্রধানত মধু, মোম এবং কাঁকড়া—এইসব সংগ্রহ করা। মহাজন থেকে নৌকা ভাড়া করে বেশ কয়েকদিনের খাবার-দাবার, পানীয়জল, কয়েকশো বিড়ির বান্ডিল, ধামা, সংগৃহীত মধু জমা করার মুটকী; এইসব নিয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকতেন। এই যাত্রা দুঃসাহসী যাত্রা। জঙ্গলের গভীরে গেলে মধুর চাক খুঁজে পাওয়া যেতো সঙ্গে কাঁকড়া এবং অরো কিছু সম্পদ আহরণের সুযোগ মিলত। কিন্তু প্রধান বাধা এবং শত্রু মানুষ খেকো রয়েল বেঙ্গল। কেঁদো বাঘ। এই যাত্রার শুরুতে নানা নিয়মকানুন পালন করতে হতো। বনবিবির থানে পুজো দেওয়া, বাবা দক্ষিণরায় কালুরায়ের কাছে জীবন ভিক্ষার আর্তি। দেহমনে একটা ছমছমে ভাব। কখনও দর দর করে ঘামছে আবার কখনো রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। এপারে আত্মপরিজন যাদের রেখে যাচ্ছে তাদেরও একটা অজানা ভয়ভীতি আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। যতদিন ঘরের মানুষ বনে থাকবে ততদিন ঘরের বউ বিধবা বেশে থাকতে হবে, তারপর একদিন শুভদিন দেখে ভাঁটির মুখে যাত্রা শুরু। সামনা সামনি শত্রুর মুখোমুখি হওয়া যায়। কখনো কখনো মোকাবিলাও করা যায়। কিন্তু এখানে শত্রুর কোনো নির্দিষ্ট অবস্থিতি নেই। জঙ্গলের সর্বত্রই তাদের অবাধ বিচরণ ভূমি। কোন ঝোঁপের আড়ালে তারা অনুপ্রবেশকারীদের উপর নজর রেখে যাচ্ছেন, তা মালুম করা বিধাতারও অসাধ্য কাজ। জঙ্গলের খাল ধরে অনেকটা দূরে গিয়ে অভিজ্ঞতা থেকে যে অঞ্চলগুলিতে বেশ মৌচাকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এমন জায়গায় বনের ধারে নোঙর ফেলে, তারপরে জঙ্গলে ঢোকার প্রস্তুতি। প্রথমে নেমে গুণিনের জঙ্গল বাবার মন্ত্র উচ্চারণ, তারপর গুটি গুটি পায়ে কিছু দুবলা জাতীয় মানুষ। কোনো অস্ত্র হাতে না নিয়ে জঙ্গল চিরে ঢুকতে থাকে। মরণ কোথায় ফাঁদ পেতে আছে, জানা নেই কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ভীতি আর লোভের লড়াই করতে করতে মধুর সন্ধানে লেগে যায়। এই পথ মৃত্যুর পথ। তবু এ নেশায় যাঁরা আসক্ত হয়ে গেছেন তাঁরা বারবার জঙ্গলে ফিরে আসেন। কখনও সখনও যতজন আসেন সবাই ফিরে যেতে পারেন না। যাক এই ধরনের যাত্রার বহুক্ষেত্রে আমার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সুযোগ হয়েছে তাই তার বিশদ বর্ণনা দিতে গেলে অন্য গল্পে ঢুকে যেতে হবে।

থাক যেটা বলছিলাম আমি যে দ্বীপটিতে অর্ধ শতাব্দীর বেশি কাল কাটিয়েছি সেখানে সব মানুষ মহাল করতে যেতেন না। ওপারে জঙ্গল এপারে আবাদ সেই বনের কাছাকাছি থাকা মানুষগুলি বেশি মহাল করতে যেতেন। এরা কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এবং সমবৎসর আয়ের সুযোগও ছিল না। যেমন গোটা দ্বীপের পাখিরালয় পার্শ্বস্থ দয়াপুর আবার রাণীপুর উত্তরডাঙার গরীব মানুষরাই সাধারণত

মহালে যেতেন। বেশিরভাগই আয় উপার্জনের জন্য চাষের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অন্য পেশার মধ্যে পাখিরালয়ে কিছু তন্তুবায় পরিবার ছিলেন। তারা তাঁত চালিয়ে কিছু উপার্জনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু পরে সেগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরডাঙা, রাণীপুরের দিকে কয়েকঘর মুচি বাস করতেন, তারাও মরা গরুর বা অন্য পশুর চামড়া বেচে কিছু উপার্জন করতেন। কিন্তু তাদেরও সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। জমির ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য ছিল অতি প্রকট। একবার সমীক্ষা করে দেখেছিলাম যে তিনটি গ্রামের ১৭০০ একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে ৭৫ ভাগ জমির মালিকানাই ছিল ১৫ শতাংশ লোকের মধ্যে। বাকীরা ছিলেন ভূমিহীন, খেত মজুর, ভাগচাষী ইত্যাদি। গা গতর খাটিয়ে উপার্জনের পথই ছিল একমাত্র খোলা। তাদের অনেকেই সম্পন্ন চাষের বাড়িতে সারা বছর বাঁধা মজুর হিসাবে থাকতেন। তাদের বাল বাচ্চারা মনিবের ঘরে বাগাল হয়ে পেটের ভাত জোটাত। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ঢেঁকির প্রচলন ছিল। গরীব বাড়ির মেয়েরা সারা দিনমান ঢেঁকিতে ধান ভেনে দুসের-আড়াইসের চাল নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। নদীবাঁধ ভেঙে লোনা জল ঢুকে বন্যায় চাষ মার খেলে গ্রামের একটা বিরাট অংশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের হাহাকার দেখা দিত। সুন্দরবন বাসের শুরুতে লেখা পড়ার চলন খুব বেশি দেখিনি। নিম্নবর্গীয় কিছু কিছু স্কুল থাকলেও ছাত্রছাত্রীর ছিল আকাল। আমার মনে হয় বসত গড়ে থিতু হয়ে বসার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের দিনে মানুষের সঙ্গে ভাববার সুযোগ পেতেন না। তাই দরিদ্র ঘরের মেয়েদেরতো নয়ই, ছেলেদেরও স্কুলে পাঠাবার মানসিকতা খুব একটা ছিল না। আমার মনে হয় ৭০-৭২ বছর আগে শিক্ষাটা সুন্দরবনে সেল্ফ-নিড হিসাবে দেখা দেয়। দ্বীপের মানুষেরা সরকারি নির্ভর না হয়ে নিজেরাই ছোট ও মাঝারি কিছু স্কুলের জন্ম দিতে শুরু করে। গাঁয়ের দু-চারটি শিক্ষিত ছেলে প্রায় বিনা বেতনে স্কুল চালানোর দায়িত্ব নিতে থাকেন। পরিবহন ব্যবস্থা বলতে নদী পথে ছোটো বড় নৌকায় দ্বীপে মালপত্র পরিবহন; এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাওয়ার খেয়া ঘাটে নদী পারাপারের ব্যবস্থা। এর বাইরে এবড়ো খেবড়ো নদী বাঁধ ধরে অথবা বছরের ক্ষরার দিনগুলিতে মেঠো রাস্তা ধরে একমাত্র শ্রীচরণ ভরসা। আট দশ কিলোমিটার হেঁটে গঞ্জে আসার ব্যাপারটা ছেলেখেলা ছিল। দ্বীপ দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে থাকা কুটুম্বোদের ঘর যাওয়ার একমাত্র সম্বল ছিল দুটি পা, বগলে একজোড়া চটি আর কাঁধে একটা ফতুয়া জাতীয় কিছু। কুটুম্বদের বাড়ি পৌঁছলেই একবদনা জল এগিয়ে দিয়ে বলতেন পায়ের কাদা ছাড়িয়ে বসুন। যাদের ক্যানিং, কলকাতা বা ন্যাজাট বসিরহাটে যেতে হত তাদের জন্য ছিল দিন রাতে দুটি মোটর লঞ্চ। মামলা মোকদ্দমা বা একটু সম্পন্ন বাড়ির রুগীদের বা সরকারি অফিস কাছারিতে যাওয়া ছাড়া মানুষ গাঁয়ের বাইরে খুব বেশি একটা যেতেন না। স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ছিল গোসাবায় একজন ধন্বন্তরী পাশকরা ডাক্তারবাবু থাকতেন। পেট গরবরি থেকে বাঘে কামড়ানো রুগীদের একটু বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ গোটা

তল্লাটে একটাই ছিল। বাকীটা জরিবুটি, ঝাঁড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র এবং গ্রামের কোয়াক ডাক্তারদের উপর নির্ভর। লোক জন্মাত, লোক মরত, আসা যাওয়া দুদিকের দরজা ছিল খোলা। মানুষ সে সব নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। ছেলেদের চল্লিশে চালশে এবং মেয়েদের কুড়িতে বুড়ি। পতি দেবতারা বউয়ের পেট কখনও খালি রাখতেন না। তাই জন্মাবে, মরবে এটা শোকের বা আনন্দের ব্যাপার ছিল না।

মানুষ একজোট হয়ে বাস করতে গেলে একটা সমাজ গড়ে ওঠে, আর মানুষ শুধু পেট নিয়ে জন্মায় না, একটা মাথাও নিয়েও জন্মায়। একসময় নিজেদের আনন্দ সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ে গাঁয়ে গড়ে ওঠে যাত্রার দল, নানা গ্রামীণ খেলাধূলার ব্যবস্থা। মানুষগুলি যেসব এলাকা থেকে এসেছে তারা তাদের ফেলে আসা অঞ্চলের সংস্কৃতি চর্চা শুরু করেন। জঙ্গল কেন্দ্রিক একধরনের সংস্কৃতিও গড়ে ওঠে। কোথাও রাশ মেলা, কোথাও বাসন্তি পূজার জমজমাট, কোথাও কালী পুজার প্রাধান্য আবার আদিবাসী পাড়ায় ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচ গানের আসর।

দুনিয়াতে একটা কথাই সত্যি যে সবকিছু বদলায়। কোনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থায় থিতু হয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। তাই বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে একটা পরিবর্তনের বদলের হাওয়া গ্রামগুলির ভিত শুদ্ধ নাড়া দিতে থাকল। আজকের সুন্দরবনের দ্বীপে অতীতের সুন্দরবনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উন্নয়নের নামে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো গড়ে উঠেছে। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসার সুযোগ স্বল্প হলেও কিছুটা বেড়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শহুরে সভ্যতা হুড়মুড় করে সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে ঢুকে পড়ছে। গ্রামীণ সমাজ সংস্কৃতি অতীতের গর্ভে স্থান পেয়েছে। এখন মানুষ বহু থেকে এক হয়ে যাওয়ার সাধনায় মগ্ন। ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রায় ভোগপাগলামীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুন্দরবনের দ্বীপেও ভোগ কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি সেবা, বাজারে কেনার সামগ্রি।

কিন্তু পাল্টায়নি কয়েকটি জিনিস। প্রথমতঃ সুন্দরবনের দ্বীপ এখনো এক ফসলি। দ্বিতীয়ত- মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান কিন্তু চাষের জমি এক ছটাক বাড়েনি। বরঞ্চ প্রতিবছরই সমুদ্র-নদী এরা কিছু অঞ্চলকে গ্রাস করে নিচ্ছে। কোনো বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি বা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প অনুদান না পেলে মুখ থুবড়ে পড়ে তাই উপার্জনের সুযোগ খুব একটা বেড়েছে এটা ঘটনা নয়। কিন্তু দুর্বার গতিতে বেড়ে চলেছে মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং এই চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে চরম বৈষম্য দ্বীপগুলির বড় অংশকে অনুদান নির্ভর ভাঙা মানুষ হিসাবে বাঁচতে বাধ্য করছে। নয়তো সুন্দরবন ছেড়ে আরেকবার উদ্‌বাস্তু হয়ে সারা ভারতের কোনো কোনো নূতন আবাসের সন্ধানে ছুটতে হচ্ছে। জানিনা এর শেষ কোথায়?